বাংলাদেশের নারী কৃষক
অবমূল্যায়ন ও অস্বীকৃতির আধার

মেঘনা গুহঠাকুরতা
সুরাইয়া বেগম

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ

বাংলাদেশের নারী কৃষক
অবমূল্যায়ন ও অস্বীকৃতির আধার

মেঘনা গুহঠাকুরতা
সুরাইয়া বেগম

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG
SOUTH ASIA

RESEARCH INITIATIVES BANGLADESH

বাংলাদেশের নারী কৃষক
অবমূল্যায়ন ও অস্বীকৃতির আধার

মেঘনা গুহঠাকুরতা
সুরাইয়া বেগম

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর, ২০১৮

প্রকাশনায়
রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)
বাসা ০৭ (কাজলী), সড়ক ১৭, ব্লক সি
বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ
ফোনঃ (+৮৮০-২) ৯৮২০০৫১-২
Email: rib@citech-bd.com
Website: www.rib-bangladesh.org

সহায়তায়
রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফ্টুং
ফ্রাঞ্জ-মেহ্রিং-প্লাটজ্ ১
১০২৪৩, বার্লিন, জার্মানী
Website: www.rosalux.in
www.rosalux-southasia.org

মুদ্রণে
ডানা প্রিন্টার্স লিমিটেড
গ-১৬ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১৩

প্রচ্ছদ
নীলফামারীর বেরাকুঠি গ্রামের
মমতা রানী তার উঠনের সবজী ক্ষেতে

Undervalued and Barely Recognized: Women Farmers in Bangladesh

Meghna Guhathakurta
Suraiya Begum

Published in: December, 2018

Published by
Research Initiatives, Bangladesh (RIB)
House 7 (Kajoli), Road 17, Block C
Banani, Dhaka- 1213, Bangladesh
Phone: (+880-2) 9820051-2
E-mail: rib@citech-bd.com
Website: www.rib-bangladesh.org

Supported by
Rosa Luxemburg Stiftung
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin, Germany
Website: www.rosalux.in
www.rosalux-southasia.org

Printed by
Dana Printers Limited
Ga-16 Mohakhali C/A, Dhaka-1213

Cover Picture
Mamota Rani working at vegetable field in her courtyard at berakuthi, Nilphamari

Sponsored by the Rosa Luxemburg Stiftung e.V with funds of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) আনন্দের সাথে প্রকাশ করছে মেঘনা গুহঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম রচিত বই "বাংলাদেশের নারী কৃষক: অবমূল্যায়ন ও অস্বীকৃতির আধার ।" রিইব এর চলমান প্রকল্প "Agroecology from Below : Pedagogy and Participatory Action (2018)"-এর একটি ফসল এই একশন রিসার্চ ভিত্তিক গ্রন্থটি । একাজে সহায়তা প্রদান করেছে জার্মানী ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান Rosa Luxemburg Stiftung । এই গ্রন্থের তথ্য আহরণ করা হয়েছে দুটি এলাকার নারী কৃষকদের কাছ থেকে গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে । এলাকা দুটি হচ্ছে সাতক্ষীরা ও নীলফামারী জেলা । তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কাজ করেছেন গবেষণা সহকারী চৈতন্য কুমার দাস এবং মোঃ আবুল ফজল । দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী নারী সদস্যদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা, তাদের প্রাণবন্ত উপস্থাপনা, তথ্য প্রদান এবং আন্তরিক সহযোগিতার জন্যে ।

মেঘনা গুহঠাকুরতা
সুরাইয়া বেগম
ডিসেম্বর ২০১৮

সূচিপত্র

ভূমিকা	৫
গবেষণার প্রেক্ষাপট	৬
পদ্ধতি গবেষণা	৮
প্রকল্প এলাকা	৮
বেড়াকুঠি, নীলফামারী	৮
জয়চণ্ডী, নীলফামারী	৯
বংশীপুর, সাতক্ষীরা	৯
ধুমঘাট, সাতক্ষীরা	১০
গৃহস্থালির নমুনা বৈশিষ্ট্য	১১
গবেষণা ফলাফল (Research Findings)	১৮
ক) নারী কৃষকদের কৃষিভিত্তিক কাজের রূপান্তরণ	১৯
খ) উৎপাদন খরচ: দারিদ্র্যের প্রকৃতি	২১
গ) মজুরি কাঠামো	২৪
ঘ) জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার	২৫
ঙ) ভূমি ও সম্পদে নারীর প্রবেশাধিকার	২৬
চ) সামাজিক মাত্রা: স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রযুক্তি	২৬
ছ) সিদ্ধান্তগ্রহণ ও সচেতনতা	২৮
জ) আঞ্চলিক বৈচিত্র্য	২৯
সারসংক্ষেপ বিশ্লেষণ	২৯
ভবিষ্যৎ অভিমুখে	৩১
তথ্যসূত্র	৩২

ভূমিকা

উন্নয়নশীল বিশ্বের সবখানেই গ্রামীণ নারীরা কৃষি ও চাষাবাদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে কৃষিনির্ভর শ্রমশক্তিতে নারীর সংখ্যা ৫০ শতাংশের চেয়েও বেশি, যা কোন ব্যতিক্রম নয়। সাম্প্রতিক সময়ে মূল্যবোধ ও নিয়ম নীতি পরিবর্তনের ফলে, কৃষিক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। ঐতিহ্যগতভাবে গ্রামাঞ্চলের প্রান্তিক পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রধানত নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বীজ সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণে তাদের প্রথাগত ভূমিকার কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আকালের মৌসুমেও খাদ্য সংরক্ষণে নারীরা সচেতনতা ও দক্ষতা প্রদর্শন করে। এ বাদেও মনে করা হয় যে, বাংলাদেশের কৃষিখাতে নারীরা সে অর্থে দৃশ্যমান নয়। যা এ ধারণা দেয় যে, পর্দার সাংস্কৃতিক বোধের ফলে বিচ্ছিন্নতা ও নারী শ্রমিক হিসাবে অবমূল্যায়নের কারণে নারীরা কৃষি উৎপাদনে সম্পৃক্ত নয়। (Kabeer, 1994, Rahman, 2000)।

শস্য উৎপাদন এবং এর সাথে সম্পৃক্ত কাজের সম্প্রসারণের জন্য বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষ বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যা উচ্চ মূল্যের শস্যের ফসলের (high value crops) উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে নারীদের সম্পৃক্ত করবে। ফলস্বরূপ, এসব প্রকল্পের মাধ্যমে আশা করা হয় নারীরা খাদ্য শস্যের উৎপাদন, বনায়ন, সবজি চাষ, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, ফসল কাটার পরবর্তী কাজসমূহ ও সেচ কাজে অংশগ্রহণ করবে।

বর্তমানকালে বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারিক গবেষণা সাক্ষ্য দেয় যে, সম্পদের উপর নারীদের ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন গবেষণার ফলাফলে লাভজনক প্রভাব রাখছে। ক্যাশ আয় ও সম্পদে নারীদের অংশীদারীত্ব বাড়ছে, বিশেষ করে কৃষি খামারে খাবার খরচে কৃষিজমিকে দেখা হয় বাজেট বৃদ্ধির অংশীদার এর ভিত্তিতে (Haddinott & Haddad, 1995, Dutro & Udry, 2004)। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গবেষণাসমূহ তুলে ধরছে যে, সম্পদের উপরে যদি মায়ের নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় থাকে তাহলে তা শিশুর পুষ্টি এবং শিক্ষায় প্রভাব রাখে (Hallman 2003)

গবেষণার প্রেক্ষাপট

বর্তমান গবেষণাটি করা হয়েছে, জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি (agroecology) বিষয়ক একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পের অধীনে যেটি Rosa Luxemburg Stiftung এর সহায়তাপুষ্ট এবং এর সহযোগী সংস্থা রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব) দ্বারা বাস্তবায়িত।

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো:

- বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিবেশগত এলাকায় কৃষি উৎপাদনের বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে "কৃষি-প্রতিবেশ নীতি" একশন রিসার্চের (গণগবেষণা) মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা;

এই প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো:

- কৃষি-প্রতিবেশ নীতি গ্রহণে স্থানীয় ও লোকজ সুস্থায়ী কৃষি চর্চা প্রসারিত করা;
- কৃষি-প্রতিবেশ এবং পরিবেশের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সাম্প্রতিক বৈশ্বিক ও স্থানীয় জ্ঞান সম্পর্কে কৃষকদের সচেতন করে তোলা;
- অনুধাবন, শিক্ষণ এবং জ্ঞানের ভিত্তিতে রাজনীতিবিদ, নীতি নির্ধারক, কৃষিবিদ এবং নাগরিকদের মাঝে প্রচার ও প্রসার করা।
- বাংলাদেশের অন্যান্য কৃষি প্রতিবেশ এলাকাগুলোতে অর্জিত জ্ঞানের সম্প্রসারণ।

যদিও জৈবকৃষি ব্যবস্থার চর্চা ক্রমবর্ধমান জাতীয় ও বৈশ্বিক জনসংখ্যাকে এককভাবে সহায়তা দিতে সমর্থ বিষয়টিকে তর্কসাপেক্ষ মনে করা হয়, তারপরও কৃষি-প্রতিবেশ বা এগ্রো-ইকোলজিক্যাল গবেষণা ও বিদ্যমান লোকজ সম্পদসমূহ (স্থানীয় বীজ, জৈব সার, প্রাকৃতিক কীটনাশক, মাটি সংরক্ষণ পদ্ধতি) প্রথাগত চাষাবাদের অন্তর্নিহিত চমকপ্রদ দিকগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরে। যেমন, ঝুঁকি মোকাবেলার ক্ষমতা, উৎপাদন ও সংরক্ষণে, জৈব পদ্ধতির ব্যবহার, বিশেষভাবে কৃষি-প্রতিবেশ ব্যবস্থায় জীববৈচিত্র্যের কার্যকরি ব্যবহার প্রভৃতি।

অধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, জৈব কৃষির কার্যকরি ব্যবহার বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্র কৃষক খামারের জন্যে যথার্থই সহায়ক, যেখানে স্থানীয়ভাবে জৈব ইনপুট উৎপাদন এবং ব্যবহার সম্ভব বলে প্রমাণিত। স্থানীয় চর্চার মধ্যে রয়েছে মাটির সুস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন জৈব কম্পোস্ট সার তৈরির মাধ্যমে মাটিতে অনুজীব বৃদ্ধি, স্থানীয় উৎস ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, যেসব পোকা-মাকড় পরাগায়ন করে থাকে তাদের সুরক্ষা এবং উপকারী পোকা (মাকড়সা, পিপড়া), বিভিন্ন প্রাণীকে (শামুক, মাছ, পাখি) জমিতে নিয়ে আসা, পরিবেশ রক্ষা এবং বায়ুদূষণ রোধক (anti-air pollutant) প্রজাতির গাছ বপন করা। এটা প্রকৃতপক্ষে, কৃষি খামারগুলোকে জৈব কৃষিভিত্তিক ভাবে পুর্নগঠন করার একটা প্রক্রিয়া। যেটা অন্যপক্ষে কৃষি প্রতিবেশ নির্ভর পদ্ধতিসমূহের (পুষ্টিচক্র, জৈব উপকরণগুলি পুঞ্জিভূতকরণ, জৈব প্রক্রিয়ায় কীটনাশক নিয়ন্ত্রণ) প্রবর্তনকে ত্বরান্বিত করে। এছাড়াও জৈব কৃষি পদ্ধতি কৃষির নিবিড়করণ স্পষ্টভাবে বোঝা এবং

নারী কৃষকদের নিয়ে দলীয় সভা

বিশেষ পরিবেশ অনুযায়ী তা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে একটি বিকল্প পথের প্রস্তাব দেয় । এই ধারণা কৃষি খামারের বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্পদ এবং ইনপুটের ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্বারোপ করে, সেই সাথে কৃষি ব্যবস্থার জৈবিক নীতিসমূহ এবং সম্পদসমূহের জানা বোঝাকে একত্রীভূত করে । এর ভিত্তিতে, নারী কৃষকদের উপর একটা বিশেষ কর্মগবেষণা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল ।

জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষিকে নীচ স্তর থেকে দেখার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, খাদ্য আহরণকারী উৎপাদকদের দেখার প্রেক্ষিত তৈরি হয় । যা বিভিন্ন ইস্যু যেমন, লোকজ চর্চ্চার গবেষণা, নারী আদিবাসী ও দলিতদের অন্তর্ভূক্তি করা যারা কিনা ঐতিহাসিকভাবে কৃষিতে অবদান রেখেছিল - এসবের প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা্ করে । সংক্ষেপে, জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি নিম্লোক্ত বিষয়ে   প্রস্তাব করে:

- কৃষিভিত্তিক উৎপাদনের স্থায়ীত্বের উপর আলোকপাত ।
- পরিবেশগত অবনতি, ঝুঁকি মোকাবেলা ।
- শস্য ও খাদ্যাভাসে বৈচিত্র্য ।
- নগরায়নের ফলে ভূমিলোপ রোধ যেটা বছরে প্রায় ১% ।
- উপার্জনের জন্য কর্মজীবী শ্রেণিকে নিয়ে আসা ও তাদের জমিতে উৎপাদনমুখী সম্ভাবনার সম্প্রসারণ এবং বৃহৎ জমি মালিকদের উপর নির্ভরশীল না করা ।

- জলবায়ু পরিবর্তনের পরোক্ষ কারণ খুজে বের করা।
- নারী, আদিবাসী ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে কৃষি উৎপাদনের মূল ধারায় নিয়ে আসা।
- স্বল্পমেয়াদি সমস্যা সমাধান করা এবং দীর্ঘমেয়াদির জন্য কৌশল খুজে বের করা।

গবেষণা পদ্ধতি

১৫ জন নারী কৃষকের চারটি দল গঠন করা হয়েছিল যারা রিইব এর জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি প্রকল্পের চারটি গ্রামের অধিবাসী। নারী অংশগ্রহণকারীদের গৃহস্থালী ও জীবনযাত্রার ধরন জানার জন্য একটা ছোট জরিপ করা হয়েছিল। অংশগ্রহণকারীদের প্রাত্যহিক চ্যালেঞ্জ বা ঝুঁকি বিষয়ে সম্পূরক তথ্য পাওয়ার জন্য প্রত্যেক গ্রামের নারী কৃষকদের নিয়ে ৩টি করে মোট ১২টি এফজিডি বা দলীয় আলোচনা করা হয়েছে।

প্রকল্প এলাকা

বড় প্রকল্প হিসাবে, নীলফামারী, বগুড়া, সাতক্ষীরা ও চট্টগ্রাম জেলায় চারটি প্রকল্প এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। নারী কৃষকের উপর একশন রিসার্চ করার জন্য শুধু দুটো জেলা থেকে চারটি গ্রাম নির্ধারণ করা হয়েছে। সেগুলো হলো: নীলফামারী জেলার বেরাকুঠি ও জয়চণ্ডী গ্রাম এবং সাতক্ষীরা জেলার বংশীপুর ও ধুমঘাট গ্রাম। গ্রামগুলো নির্বাচন করা হয়েছে প্রতিবেশে বৈচিত্রের চিত্রায়ন, জনসংখ্যা এবং অঞ্চল (নীলফামারী বাংলাদেশের উত্তরের অংশ এবং সাতক্ষীরা দক্ষিণ-পশ্চিম) এবং সেই সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ে জনগণের কাছে সহজে যেতে পারার উপর ভিত্তি করে। নিচে প্রত্যেক গ্রামের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে দেওয়া হলো যা সংগৃহীত উপাত্তের বিশ্লেষণে সহায়ক হবে।

বেড়াকুঠি, নীলফামারী

বেড়াকুঠি, নীলফামারী সদর উপজেলা থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এ গ্রামের প্রধান অর্থনৈতিক উৎপাদন বা পণ্য হলো ধান ও সবজি এবং কিছু মসলা যেমন পেঁয়াজ, আদা, রসুন প্রভৃতি।

গ্রামটি হিন্দু অধ্যুষিত। অসাম্প্রদায়িক ঐক্য মোটামুটি বিরাজমান কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব মুক্ত নয়। ঔপনিবেশিক সময়ে এ এলাকা নীল চাষের জন্য পরিচিত ছিল। এলাকাটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা থেকে মাত্র ৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত যেখানে গ্রামের অধিকাংশ মহিলারা কাজ করে। রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ পণ্যের মধ্যে নারীদের জন্য কৃত্রিম চুল প্রধান এবং সেজন্যই নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে নারীরা অগ্রাধিকার লাভ করে। এছাড়া এ গ্রামের মেয়েরা হস্তশিল্প হিসেবে বিক্রির জন্য পাটের মাদুর তৈরি করে।

বেরাকুঠী গ্রামে দলীয় সভা

জয়চণ্ডী, নীলফামারী

জয়চন্ডী, নীলফামারী সদর উপজেলার সোনারায় ইউনিয়নে অবস্থিত। এটা সমতল ভূমিতে অবস্থিত। প্রধান ফসল ধান এবং সবজি যদিও মৌসুমে বিভিন্ন মসলা ও মরিচ চাষ করা হয়। হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীর অনুপাত ৪০ ঃ ৬০। জয়চণ্ডী গ্রাম থেকে ২ কিলোমিটার দূরে রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা রয়েছে এবং এ গ্রামের অল্প বয়স্ক নারী ও পুরুষ সবাই সেখানে কর্মরত। যাদের পারিশ্রমিক ৫০০০-১৫০০০ টাকার মধ্যে।

বংশীপুর, সাতক্ষীরা

বংশীপুর গ্রাম সাতক্ষীরা শহর থেকে ৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। এ গ্রামের অধিকাংশই মুসলমান কিন্তু হিন্দু ৪২% যা গড় জাতীয় সংখ্যার চেয়ে বেশি। অন্যান্য সম্প্রদায় যেমন, খ্রিস্টান এবং আদিবাসী মুণ্ডা সম্প্রদায়ও রয়েছে এ গ্রামটিতে। সমতল ভূমিতে অবস্থিত হওয়ার কারণে এটা একই সাথে ধান ও চিংড়ি চাষের এলাকা। অনেকেই জেলে, যারা মাছ ধরতে সমুদ্রে যায়। মাটিতে লবণাক্ততা বিদ্যমান এবং এটা ধান বৈচিত্র্যের এলাকা। দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি মাছ গুদাম রয়েছে এ গ্রামে। পুরুষরা প্রায়ই মৌসুম ভিত্তিতে শ্রম বিক্রি করতে অন্যত্র যায়। মহিলারা গৃহস্থালি কাজের পাশাপাশি প্রায়ই কৃষিনির্ভর শ্রমে

নিয়োজিত হয় এবং চিংড়ি খামারে কাজ করে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনভূমি সুন্দরবনের তীরে হওয়ায় কাজের মধ্যে আরো অন্তর্ভুক্ত গোলপাতা (ঘরের চাল ছাওয়ার জন্য পাতা), কাঠ, মধু আহরণ ও কাঁকড়া সংগ্রহ। এলাকাটি ছোট নদী এবং লেক দ্বারা পরিবেষ্টিত তাই মাছ ধরার জন্যও উপযুক্ত।

বংশীপুর গ্রামের দলীয় নেত্রী

ধুমঘাট, সাতক্ষীরা

ধুমঘাট, সাতক্ষীরার শ্যামনগর ইউনিয়ন থেকে ১০/১২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। গ্রামটির শেষপ্রান্ত আদিবাসী মুণ্ডা সম্প্রদায় অধ্যুষিত। এলাকাটিতে যেহেতু অনেক নদী ও খাল প্রবাহিত তাই মাছ ধরাই হলো সেখানকার প্রধান অর্থনৈতিক কার্যাবলি। মহিলারা, বিশেষত বয়স্ক নারীরা এসব জায়গায় মাছ ধরে। বোরো মৌসুমে পানির ঘাটতি হয় এবং এ এলাকা লবণাক্ততা সমস্যায় পড়ে। গ্রামীবাসীরা স্থানীয় প্রজাতির গবাদিপশু পালন করে। পরিবারের পুরুষ সদস্যরা মৌসুমি অভিবাসন শ্রমে এবং মেয়েরা তাদের এলাকাতে শ্রম দিয়ে থাকে। এ গ্রামে জ্বালানি ঘাটতিও রয়েছে। এলাকাটি চার্চের প্রভাবাধীন। কিন্তু দীর্ঘদিনের ইতালিয়ান ক্যাথলিক চার্চ তাদের আত্মনিবেদিত ধর্মযাজকের সহায়তায় এসব সম্প্রদায়ের মহিলাদের শিক্ষার উন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। ফলশ্রুতিতে, মহিলাদের বিভিন্ন পেশায় যেমন শিক্ষাদান ও সেবাদান এ দেখা যায় এবং তুলনামূলকভাবে তাদের পুরুষ সদস্যের চেয়ে তারা বেশি শিক্ষিত।

গৃহস্থালির নমুনা বৈশিষ্ট্য

প্রকল্পের স্থানীয় গবেষণা সহকারীর সাহায্যে চারটি গ্রামের প্রতিটা গ্রুপের ১৫ জন সদস্য অর্থাৎ চারটি গ্রুপের মোট ৬০ জন নারীর সাধারণ গৃহস্থালি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ কাজটা করা হয়েছে ছয় মাসে এবং প্রতিটা গ্রুপে তিনটি করে মোট ১২টি দলীয় আলোচনার মাধ্যমে। বেশিরভাগ নারীরা এসেছিল সেইসব পরিবার থেকে যেগুলোর পরিবার প্রধান পুরুষ। ১১টি পরিবার যা মোট পরিবারসমূহের ১৮.৩৩%, যাতে নারীরা পরিবার প্রধান। নীলফামারীর গ্রাম দুটোতে বেশি নারী পরিবার প্রধান ছিল সাতক্ষীরার গ্রামগুলোর চেয়ে। (সারণি-১)

সারণি-১ : সাক্ষাৎকার দাতার পরিবারের প্রধান (নারী/পুরুষ ভেদে)

পরিবার প্রধান	নীলফামারী		সাতক্ষীরা		মোট	%
	বেড়াকুঠি	জয়চন্ডি	বংশিপুর	ধুমঘাট		
নারী	৪	৩	২	২	১১	১৮.৩৩
পুরুষ	১১	১২	১৩	১৩	৪৯	৮১.৬৬
মোট	১৫	১৫	১৫	১৫	৬০	১০০

নারী অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অধিকাংশের বয়সই ছিল ৪১-৪৫ এর মধ্যে এবং অধিকাংশই বিবাহিত। (চিত্র-১)

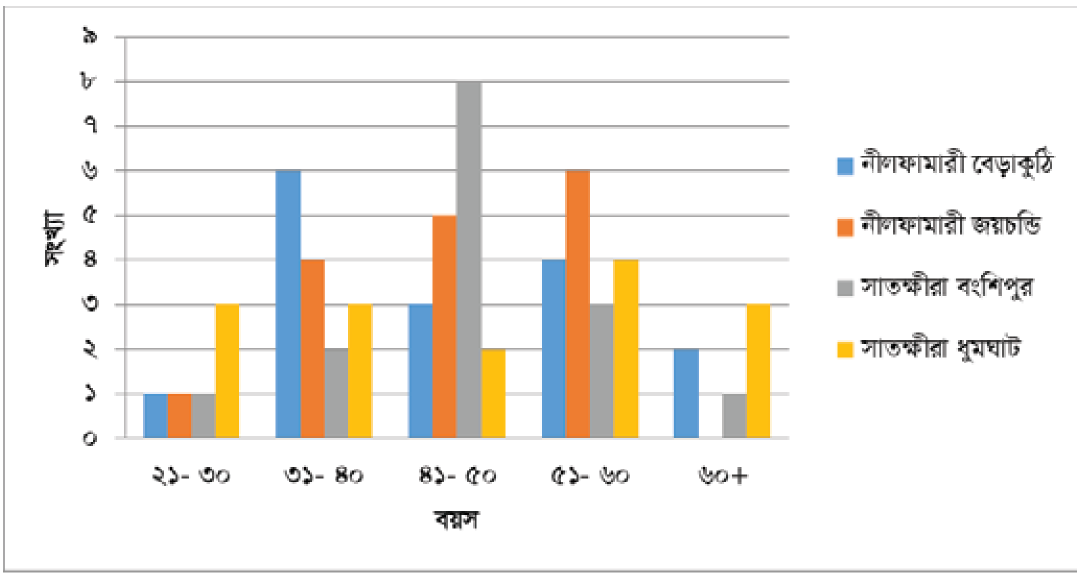

চিত্র ১: সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর বয়সের হার

সেখানে অবিবাহিত কেউ ছিল না। (সারণি-২)

চালকুমড়োর বড়ি দেওয়া: নরীদের মজুরীহীন শ্রম

সারণি-২ : সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর বৈবাহিক অবস্থা

বৈবাহিক অবস্থা	নীলফামারী		সাতক্ষীরা	
	বেড়াকুঠি	জয়চণ্ডি	বংশিপুর	ধুমঘাট
অবিবাহিত				
বিবাহিত	৯	১২	১০	১২
বিধবা	৫	৩	৪	৩
স্বামী-পরিত্যক্তা	১		১	
মোট	১৫	১৫	১৫	১৫

গ্রামগুলোর অধিকাংশ নারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা স্বাক্ষর জ্ঞান পর্যায়ের। নীলফামারীতে এমন কোন নারী অংশগ্রহণকারী ছিল না যে নবম-দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে, পক্ষান্তরে সাতক্ষীরাতে ছিল। এর কারণ হলো উক্ত এলাকায় (সাতক্ষীরায়) চার্চ প্রদত্ত শিক্ষার প্রভাব। (চিত্র-২)

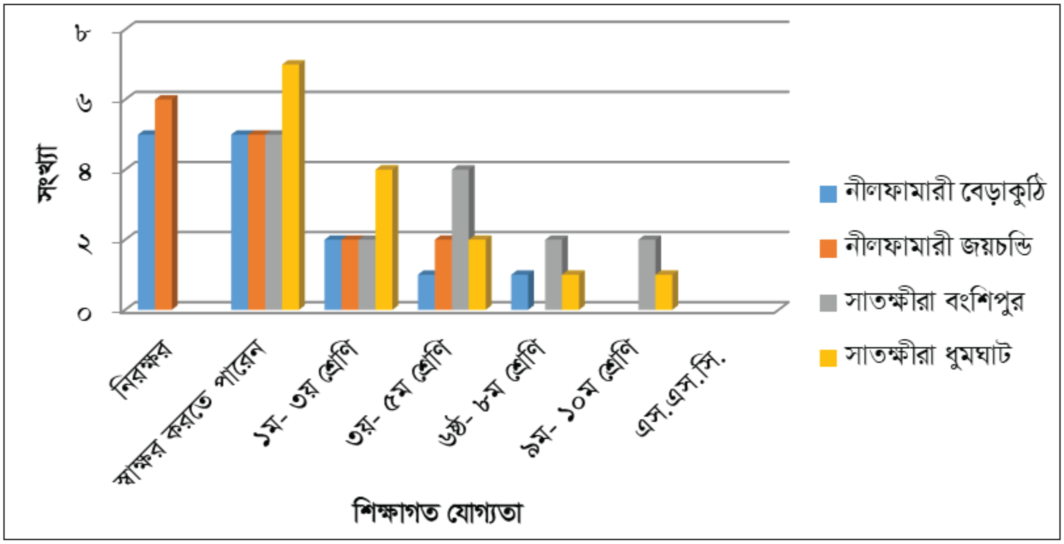

চিত্র ২ : সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা

গ্রামগুলোর অধিকাংশ নারীই নিজেদেরকে গৃহিনী ও কৃষি শ্রমিক হিসেবে অভিহিত করেছেন। শুধু ধুমঘাটে একটা অংশ নিজেদেরকে দিন মজুর বলেছেন। (সারণি-৩) এটা হতে পারে আদিবাসী মুণ্ডা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্তির কারণে যারা মূলত তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য কায়িক পরিশ্রমের উপর নির্ভরশীল।

সারণি-৩ : সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর পেশা

পেশা	নীলফামারী		সাতক্ষীরা	
	বেড়াকুঠি	জয়চন্ডি	বংশিপুর	ধুমঘাট
গৃহিনী + কৃষি	৯	১৩	১৫	৫
গৃহিনী + কৃষি + দিনমজুর	৬	২		১০
মোট	১৫	১৫	১৫	১৫

অধিকাংশ অংশগ্রহণকারীদের মাসিক গড় আয় ৫০০-১০০০ এবং পরের ধাপে ১৫০১-২০০০ এর মধ্যে। দুজন অংশগ্রহণকারীকে দেখা গেছে তাদের আয়ের পরিমাণ ৫০০১ থেকে ৬০০০ টাকা এবং তারা দুজনই নীলফামারী এলাকার। (সারণি-৪)

সারণি-৪ : সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর মাসিক আয়

মাসিক আয় (টাকা)	নীলফামারী		সাতক্ষীরা	
	বেড়াকুঠি	জয়চন্ডি	বংশিপুর	ধুমঘাট
৫০০- ১,০০০	৮	৮		
১,০০১- ১,৫০০			১	৩
১,৫০১- ২,০০০	১	৩	১	৭
২,০০০- ২,৫০০		১		
২,৫০১- ৩,০০০		১	৫	৩
৩,০০১- ৪,০০০	২		৮	
৪,০০১- ৫,০০০	৩	১		২
৫,০০১- ৬,০০০	১	১		
মোট	১৫	১৫	১৫	১৫

নারীদের মধ্যে ২০ জনের পরিবারের ৭ থেকে ১০ শতক জমি রয়েছে তাদের বসতভিটার সাথে। অংশগ্রহণকারীদের পরিবারের অনেকেই ০৬ শতক জমির মালিক। তবে কোন পরিবারেরই বসতভিটার সাথে সংলগ্ন জমি ৬৬ শতকের অধিক নেই। (সারণি-৫)

নীলফামারীর বেরাকুঠীতে স্বাক্ষরপত্রে সাক্ষর প্রদান

সারণি-৫ : সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর পরিবারের বসতভিটা সংলগ্ন কৃষি-জমির পরিমাণ

পরিবারের বসতভিটা সংলগ্ন কৃষি-জমির পরিমাণ (শতক)	নীলফামারী	সাতক্ষীরা		
	বেড়াকুঠি	জয়চন্ডি	বংশিপুর	ধুমঘাট
১- ৩	৩	৮	১	২
৪- ৬	৫	৫	১	১
৭- ১০	৫	২	৮	৫
১১- ১৫	২		১	৬
১৬- ২০			২	১
২১- ২৫	১			
৩৩				
৫০			১	
৬৬			১	
মোট	১৫	১৫	১৫	১৫

বসতবাড়ির সাথে সংলগ্ন জমি ছাড়াও, অংশগ্রহণকারী ২১.৬৬% ৬১ থেকে ৮০ শতক পারিবারিক ও চাষাবাদের (ধান, সবজি ও অন্যান্য) জমির মালিক এবং অংশগ্রহণকারীদের ১৩.৩৩% ১ থেকে ১০ শতক পরিমাণের পারিবারিক জমির মালিক। (সারণি-৬)

সারণি-৬ : সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর পরিবারের জমি বিষয়ক তথ্য

পরিবারের মোট কৃষি-জমির পরিমাণ (শতক)	নীলফামারী		সাতক্ষীরা মোট		শতাংশ	%
	বেড়াকুঠি	জয়চন্ডি	বংশিপুর	ধুমঘাট		
১- ১০	২	৬			৮	১৩.৩৩
১১- ২০	১			১	২	৩.৩৩
২১- ৪০	১	২		১	৪	৬.৬৬
৪১- ৬০	৩			১	৪	৬.৬৬
৬১- ৮০	৪	১	৩	৫	১৩	২১.৬৬
৮১- ১০০	১	১	২	৩	৭	১১.৬৬
১০১- ১২০	১				১	১.৬৬
১২১- ১৪০		১	৩	১	৫	৮.৩৩
১৪১- ১৬০	১	২			৩	৫
১৬১- ১৮০	১			১	২	৩.৩৩
১৮১- ২০০		২	৩		৫	৮.৩৩
২০১- ৩০০			৪		৪	৬.৬৬
৩০০+				২	২	৩.৩৩
মোট	১৫	১৫	১৫	১৫	৬০	১০০

এবং ১১ জন অংশগ্রহণকারী নারীর (১৮.৩৩%) তাদের নিজেদের নামে জমি আছে (টেবিল ০৯)। নীলফামারীর মহিলারা কম পরিমাণে (২০ শতক জমির মালিক) এবং সাতক্ষীরা এলাকায় একজন সদস্যের অধিকতর পরিমাণে (যেমন: ১৩২ শতক পর্যন্ত) জমির মালিক। (সারণি-৭)

সারণি-৭ : সাক্ষাৎকার দাতার নিজস্ব জমির পরিমাণ

সাক্ষাতকার প্রদানকারীর নিজস্ব কৃষি-জমির পরিমাণ (শতক)	নীলফামারী		সাতক্ষীরা		মোট	শতাংশ %
	বেরাকুঠি	জয়চন্ডি	বংশিপুর	ধুমঘাট		
১- ৩	১	২			৩	
৪- ৬					-	
৭- ১০	১				১	
১১- ১৫					-	
১৬- ২০	১		১		২	
২১- ২৫						
৩৩			১	১	২	
৫০			১		১	
৭৪				১	১	
১৩২			১		১	
মোট	৩	২	৪	২	১১	১৮.৩৩

সাতক্ষীরার ধুমঘাটে বিভিন্ন প্রকার স্থানীয় জাতের ধানের ক্ষেত

গবেষণা ফলাফল

অংশগ্রহণকারীদের উপর সংক্ষিপ্ত জরিপ এবং দলগত আলোচনা যা মাঠকর্মের সময়ে করা হয়েছিল তার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত গবেষণা ফলাফলসমূহ পাওয়া গেছে। ফলাফলসমূহ নিম্নোক্ত হেড এর অধীনে সাজানো হয়েছে:

ক) নারী কৃষকদের কৃষিভিত্তিক কাজের রূপান্তরণ

খ) উৎপাদন খরচ

গ) মজুরি বৈষম্য

ঘ) জমি, সম্পদ ও বাজারে নারীদের প্রবেশাধিকার

ঙ) সামাজিক মাত্রা: স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রযুক্তি

চ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সচেতনতা

ছ) অঞ্চলগত ভিন্নতা

ক) নারী কৃষকদের কৃষিভিত্তিক কাজের রূপান্তরণ

আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম বছরের পর বছর ধরে নারী কৃষকদের কৃষি কাজের ক্ষেত্রে কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে। যেহেতু অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ নারীর বয়স মধ্য বা তার চেয়ে বেশি, তাদের মধ্যে কোন না কোন একজন একটা পরিষ্কার ধারণা দিতে পারবেন যে আগে কৃষিতে কোন ধরনের কাজ ছিল কেমন ছিল, এখন কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে এবং হচ্ছে।

বেশিরভাগ পরিবর্তনগুলো অবস্থানগত ও পরিবেশমূলক। নারীরা বলেছেন জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলস্বরূপ জমি খণ্ড-বিখণ্ড হয়েছে। পরিবেশগত অনেক পরিবর্তনও দৃশ্যমান। আগে কিছু এলাকায় বছরে শুধু একবার ধান চাষ হতো। এখন তা বছরে দুইবার হয়। সেচ ব্যবস্থা আগের চেয়ে বেশি মেশিন নির্ভর হয়েছে। নারী কৃষকদের কাজের ধরনও পাল্টেছে। ধান প্রক্রিয়াকরণ, রোদে বীজ শুকানো এবং সেগুলোকে মাটির পাত্রে সংরক্ষণ, রোপণ ছিল সাধারণ প্রথা। এখন মেশিনে ধান ভানা হয় এবং পলিথিন ব্যাগে মজুদ রাখা হয়। ভাতের স্বাদ ভিন্ন হয়ে গেছে এবং আগের মত ভালো না। ধান আর এখন মিল ছাড়া ঢেঁকিতে ভানা হয় না । ঢেঁকি ব্যবহার করা হতো ধানকে খোসা ছাড়িয়ে চালে রূপান্তর করতে। এটা মহিলাদের কাজ ছিল। এটা বয়স্ক নারীদের কাছে পরিচিত ছিল লক্ষী হিসেবে (লক্ষী-সৌভাগ্যের প্রতীক)। এখন মানুষ চাল তৈরি করতে ধান কল ব্যবহার করে থাকে।।

নারীরা বর্তমানে কী ধরনের কাজ করে এবং সেই কাজে কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে সে সম্পর্কে তারা বলেন। সাধারণত ঘরের পাশের বাগান করা, পতিত জমিতে চাষাবাদ করা, অনেক সময় সেখানে তারা ধানও রোপন করে। তবে ঘরের সংলগ্ন জমিতে সাধারণত সবজি চাষ করে যেমন, ঢেঁড়স, বেগুন, কচু, সবুজ শাকসবজি, শিম, পালংশাক এবং মরিচ। তারা অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, পুকুর বা খালে মাছ ধরে, গবাদিপশু-ছাগল পালন করে এবং হাঁস-মুরগি পালন করে। সেসব এলাকা যেখানে গবাদিপশু পালন পূর্বপুরুষদের পেশা বা আগে থেকেই চলে আসা পেশা, সেখানে নারীরা দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্য যেমন ঘি-এর ব্যবসায় নিয়োজিত হয়। ঘরের চারপাশে লাগানো ফলের গাছ যেমন, লিচু, আম, লেবু থেকে উপার্জনও বেশ আকর্ষণীয়।

প্রযুক্তির যাত্রা তাদের কাজে বেশ প্রভাব ফেলেছে। আগে বর্ষার মৌসুমে নারীরা আগাছা নিড়ানির কাজে নিয়োজিত হত, বর্তমানে আগাছা দূর করতে আগাছানাশক ব্যবহার করা হয়। কৃত্রিম কীটনাশক, আগাছানাশক এবং সার এর ব্যবহার বাড়ছে কিন্তু মাঝে মাঝে কীটনাশক কার্যকর নয়। বীজ সংরক্ষণ পুরোটাই প্রায় নারীদের বিশেষ ক্ষমতায় ছিল। তারা ধান, মিষ্টি কুমড়া, লাউ, পুঁইশাক, ধুন্দল, ঝিঙ্গে-এর বীজ সংরক্ষণ করত। এই প্রযুক্তিটা তারা পরিবারের বয়স্ক নারীদের কাছ থেকে শিখতেন এবং বংশপরম্পরায় তা চলত।

জয়চন্ডীতে দলীয় সদস্য বিজলী

এখন সাধারণত বাজার থেকে বীজ আনা হয় এবং পলিথিন বা বস্তায় শুকানো হয় । ধানের হাইব্রিড জাতের কারণে, বীজ সংরক্ষণ ও গুদামজাতকরণের চর্চা কমে গেছে । আগে বীজ সাধারণত মাটির পাত্রে সংরক্ষণ করা হতো ।

মধ্যবয়স্ক নারী কৃষকদের সাথে কথা বলার সময় আমরা জেনেছি কীভাবে বিষয়গুলো পরিবর্তন হয়েছে । সে সম্পর্কে তাদের ধারণা যে, ’মহিলারা মসলা গুড়ো করার জন্য ভারী পাথর (হামান দিস্তা) ব্যবহার করতেন এখন তাদের সেই সক্ষমতা নেই । তারা অনেক রকমের খাবার এবং নাস্তা বানাতেন মুড়ি ও চিড়া থেকে যেমন, মোয়া, মুড়ি-মুড়কি, নাড়ু ইত্যাদি । এখনকার নারীদের বেশির ভাগই জানেন না সেগুলো কীভাবে বানাতে হয় । তারা শুধু অলস বসে থাকেন এবং টিভি দেখেন । আমরা কঠোর পরিশ্রম করেছি তাই এখনো আমাদের শরীরে শক্তি আছে’ ।

অন্যরা বলে ‘গর্ভবতী অবস্থাকালীন সময়েও আমরা সব কাজ করেছি, এখনকার আধুনিক নারীরা এসব করে না’ । তাদের অস্তিত্বের পরিবর্তিত প্রকৃতি উল্লেখ করে তারা দাবি করেন, এখন আর গবাদি পশু চালিত লাঙ্গল দেখা যায় না । যেহেতু গরু নাই তাই দুধও তৈরি হয় না, ধানের পুরনো জাত নাই, সবজির বীজ নাই, পুরনো প্রজাতির মাছ নাই, কচ্ছপ নাই, কাঁকড়া নাই । সুন্দরবনের কাছে দক্ষিণের নারীরা বলেন, যে তাদের বাবারা বনে যেত এবং ডিম, আম এবং মাছ আনত ।

নারীরা বলেন, 'আগে স্থানীয় জাতের ধান যেমন, জামাইভোগ, বাদশাভোগ ছিল এখন আমরা হাইব্রিড ধান খাই', । মাছের জাতও পাল্টে গেছে, আগে দেশি চিংড়ি, শোল, কই, বোয়াল, মাগুর, ইলিশ ছিল আর এখন আমরা খাই সিলভার কার্প, পাঙ্গাস, তেলাপিয়া, রুই, মৃগেল, জাপানিজ পুঁটি ।'

'আবহাওয়াও পাল্টে গেছে । আগে শীতের সময়ে খুব ঠান্ডা হতো এখন আমাদের ফ্যান ব্যবহার করতে হয়, এখন খুব গরম । এটা হতে পারে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হয়েছে । হঠাৎ আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য লোকজন প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে ।' আগে কোন ব্যাংক বা এনজিও ছিল না । বর্তমানে অনেক এনজিও আছে যারা ক্ষুদ্র ঋণ দেয় ।

এসব রদবদল সত্ত্বেও, কয়েকজন নারী বলেন তাদের জীবন পাল্টে গেছে অন্তত জাগতিক উন্নতির দিক থেকে ।

দিলাওয়ারাঃ "আমি সকাল থেকে বিরতিহীনভাবে এশার নামাজ পর্যন্ত কাজ করতাম । যখন আমার ছেলের বিয়ে হয়, তখন আমি একটা ভালো শাড়ি পরতে পারিনি, এখন আমি ভালো কাপড়ের ব্যবস্থা করতে পারি ।"

আরজিনাঃ "আগে আমরা আধা কেজি চাল তিন/চার জনে মিলে খেতাম । আমরা এখন ভালো খাই ।

আগে আমার স্বামী বাঁশের টুকরো যোগাড় করত এবং সেগুলোকে বাজারে বিক্রি করত । আমরা আদিতে হাঁসমুরগি পালতাম । আমি গবাদিপশু পালন শুরু করি এবং পরে মুনাফার জন্য বিক্রি করি, শাক সবজি লাগিয়েছিলাম । আমার স্বামী কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছে । আমরা দুজনই কঠোর পরিশ্রম করেছি এবং যদিও আমরা ভালোই উপার্জন করেছি, তারপরও আমি এখনও আমার স্বামীকে বলি অন্যের জন্য কাজ করতে । আমি আমার ছেলের নামে জমি কিনেছি ।"

খ) উৎপাদন খরচঃ দারিদ্র্যের প্রকৃতি

এখন দারিদ্র্য কমেছে । এখন সংসারে আয় বৃদ্ধির জন্যে শুধু পরিবার প্রধানই না, পরিবারের সবাই অবদান রাখছে । নারী সদস্যরা ব্যাখ্যা করেন, 'আগে খাওয়ার জন্য অনেক মুখ ছিল, এখন তুলনামূলক কম মানুষকে খাওয়াতে হয় । আগে অর্থাৎ আমাদের মায়েদের অনেক ছেলে-মেয়ে হতো, কিন্তু আমাদের সময়ই ছেলেমেয়ের সংখ্যা কমে গিয়েছিল, এখন আরও কম হচ্ছে । আগে নারীদের অধিকাংশ সময় রান্নার কাজেই ব্যয় হতো, কিন্তু এখন আমাদেরকে কৃষিকাজেও অবদান রাখতে হয় । হাঁস মুরগী পালন ও গবাদি পশু লালন পালনের কথা নাই বা বললাম ।"

অনেক নারীই তাদের সংগ্রামের কথা বলেন যেটা তাদের পরিবারের উপার্জনক্ষম সদস্যের মৃত্যুর পরে শুরু হয়েছিল । "অল্প বয়সে আমার বাবা মারা যান, মা আমাকে বড় করেছেন । আগে খরচ কম ছিল, এখন তা বেড়ে গেছে । কাজ পাওয়াই একটা চ্যালেঞ্জ, কাজ পেতে সমস্যা হয় ।"

সাতক্ষীরার ধুমঘাটে দলীয় সভায় আলোচনা করছেন সুরাইয়া বেগম

সারণি-৮ : সাক্ষাৎকার দাতা নিজে জমি চাষ করেন কিনা?

জমি চাষ	নীলফামারী সাতক্ষীরা			
	বেড়াকুঠি	জয়চন্ডি	বংশিপুর	ধুমঘাট
শুধু নিজে	১৩	১৩	১২	১২
ক্ষেতমজুর ভাড়া নিয়েছেন	২	২	৩	৩
মোট	১৫	১৫	১৫	১৫

দলগুলোর অধিকাংশ নারীকেই দেখা গেছে তাদের বাড়ি বা বাড়ির পাশের জমি চাষ করতে শ্রম দিতে। অধিকাংশ নারীই হাঁস-মুরগী পালন ও গবাদিপশু লালন-পালন করে।

এখন বেশি টাকা হাতে আসে। আগে স্বামীরা তাদের স্ত্রীকে তাদের বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য চাপ দিতো। এখন ধান ও সবজি চাষ করে সেই স্বামীরাই নগদ বেশি টাকা উপার্জন করে এবং স্ত্রীদেরকে অনুমতি দেয় হাঁস-মুরগি পালন করে টাকা সঞ্চয় করতে। (সারণি-৯) কিছু বাড়িতে স্বামীরা রান্নাসহ অন্যান্য গৃহস্থালি কাজে সহায়তা করে, যা কিনা আগে কল্পনা করা যেত না। যেমন, স্ত্রী যদি কাজে থাকে তাহলে স্বামীরা নিজেরাই হাঁড়ি থেকে ভাত বেড়ে খেয়ে নেয় । তবে সবাই যে বদলে গেছে তা নয়। তাই কিছু নারী সদস্য অভিযোগ করেন, আমার যদি জ্বরও থাকে তারপরও এক গ্লাস পানিও আমার স্বামীকে ঢেলে কাছে এগিয়ে দিতে হয়।

সারণি-৯ : সাক্ষাৎকার দাতার ঘরের গবাদি পশু-পাখির সংখ্যা

গবাদিপশুর সংখ্যা	নীলফামারী		সাতক্ষীরা	
	বেড়াকুঠি	জয়চন্ডি	বংশিপুর	ধুমঘাট
গরু	৩০	৪০	৫২	৪৯
ছাগল + ভেড়া	১৭	২৭	৪৪	৩৮
হাঁস + মুরগী	১০৬	১৪৯	১৮৭	১৭৯
কবুতর		৫	১৮	২২

জয়চন্ডীতে নারী কৃষক অবমূল্যায়িত

গ) মজুরি কাঠামো

ধান চাষাবাদে অর্থাৎ রোপণ, কাটা, নিড়ানী ইত্যাদিতে নারীদের জন্য সাধারণ মজুরি ছিল ১৫০ টাকা কিন্তু একই কাজের জন্য পুরুষরা পায় ৩০০ টাকা যদিও নারীরা পুরুষদের চেয়ে বেশি কাজ করে। তবে ধান কাটার সিজনে, যখন কিনা শ্রমিকের চাহিদা অনেক বেশি থাকে তখন মজুরী ২০০-২৫০ টাকা পাওয়া যায়। একজন নারী বলেন, সে নিজে তার সবজি খেত চাষ করেছেন, কারণ তার স্বামী বলেছে, তার কোন সময় নেই। নারীরা আরো বলেন, তারা বর্তমানে চাষাবাদের কাজে পুরো দস্তুর শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত হওয়ায়, আগেকার মত হস্তশিল্প যেমন কাঁথা বানানো, পাটি বোনার কাজে তাদের আর সময় থাকে না।

মজুরি সাধারণত নগদ টাকায় দেওয়া হয়, এক সময় দুবেলার খাবারে সীমাবদ্ধ থাকত, তবে এ নিয়ম এখন নেই বললেই চলে। কারণ হিন্দু নারীরা মুসলিম বাড়ি থেকে খাবারের পরিবর্তে ধান, চাল নিতে বেশি পছন্দ করে। সরকারের ৪০ দিনের কার্যক্রমে মাটির কাটার কাজে নিয়ম হলো নারী পুরুষ সবাইকে দু'শত টাকা প্রদান করা হবে। কিন্তু বর্তমানে লটারির মাধ্যমে ঠিক করা হয় কাদেরকে কাজ দেওয়া হবে। অনেকে বলেন যে, মজুরী দেবার সময় পুরুষরা যেভাবে কোদাল বা লাঙ্গল ব্যবহার করে কাজ করতে পারে নারীরা সেভাবে পারে না তাই নারীদের দেওয়া হয় দু'শ টাকা আর পুরুষদের দেওয়া হয় তিনশত টাকা। ফসল কাটার সময়েও এই ব্যবস্থা একই থাকে। নীলফামারীতে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকাতে যেসব নারী ও পুরুষ কাজ করে যারা পরচুলা রপ্তানির জন্য তৈরি করে তারা মজুরী হিসাবে ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা আয় করে। স্বামী-স্ত্রী একসাথে মোটরসাইকেল বা সাইকেলে করে কাজে যায়। মায়েরা তাদের কাপড় ধোয়া, রান্না ও অন্যান্য গৃহস্থালি কাজ করে। চাহিদা অনুযায়ী তারা তিনশত বা চারশত টাকা প্রদান করে।

সাতক্ষীরার বংশীপুরে দলবদ্ধ নারীকর্মীদের দলীয় সভায় সুরাইয়া বেগম

ঘ) জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার

অধিকাংশ অংশগ্রহণকারীরাই বলেছেন তারা কৃষি সংক্রান্ত কোন সমস্যা হলে প্রতিবেশী কৃষকদের কাছে যায় সহযোগিতার জন্য। দ্বিতীয় ভাগে যারা আছে তারা দোকানিদের কাছে যায় এবং মুষ্টিমেয় কৃষি কর্মকর্তার কাছে যায়। (সারণি-১০)

সারণি-১০ : সাক্ষাৎকার দাতার কৃষিকাজে সমস্যা হলে যাদের কাছে সহযোগতার জন্য যান

কৃষি পরামর্শ	নীলফামারী		সাতক্ষীরা	
	বেড়াকুঠি	জয়চন্ডি	বংশিপুর	ধুমঘাট
কৃষি অফিসার	৩		৪	৭
দোকানদার	১০	১১	৭	১০
অন্য কৃষক	১৪	১২	১০	৫

কৃষির ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণে কার কাছে যান এ প্রশ্নের জবাবে নারীদের উত্তর নিম্নরূপ:

‘কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীরা যখন গ্রামে আসে তখন তাদের জিজ্ঞেস করি, মাঝে মাঝে নিকটবর্তী অফিসে যাই কিন্তু পর্যাপ্ত বা প্রয়োজনীয় সাড়া পাই না।’

“আমরা বেশিরভাগ সময় প্রতিবেশিদের কাছ থেকে এবং গ্রামের কৃষির সাথে সম্পর্কিত পণ্য বিক্রির দোকান থেকে পরামর্শ পাই।”

গ্রামে পুরুষদের একটি গণগবেষণা দল দীর্ঘ দুই বছর ধরে কাজ করছে এবং পুরুষ দল নিয়মিতভাবে কৃষির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে থাকে। জিগগেস করা হয়েছিল যে, পুরুষরা যা আলোচনা করে নারীরা তা জানেন না। একজন নারী বলেন, কৃষিকাজে পরামর্শদানকারী একজন অন্যদের সাথে নিয়মিত আলোচনা করতো এবং সে এখন চলে গেছে। আরেকজন নারী বলেন, সে তার চাচার কাছ থেকে অল্প একটু শিখেছেন।

আরেকজন দাবী করেন, সে পুরুষদের চেয়ে বেশি জানেন। সে এবং তার মা তাদের সবজি উৎপাদনে ভার্মি কম্পোষ্ট/কেঁচো সার ব্যবহার করেন। অন্যরা বলেন তাদের স্বামী তাদেরকে শিখিয়েছেন, জৈব সার ব্যবহার করতে যেটা তারা শিখেছেন যে, জৈব সার একটা স্বাস্থ্যকর বিকল্প।

জৈব কৃষি শুধুমাত্র জৈব সার নয় বরং এটা প্রাকৃতিকভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা সম্পর্কিত বিষয়। উদাহরণস্বরূপ: ফসলের মাঠে কাঠি পুতে অথবা ধইঞ্চা গাছ লাগিয়ে পাখি বসতে দেওয়া যাতে তারা খাদ্য- খাদক সম্পর্কের মাধ্যমে পোকা খেয়ে প্রাকৃতিকভাবে পোকার সংখ্যা কমাতে পারে। সারের পরিবর্তে ছাই ব্যবহার করা হয়। একজন নারী বলেন এর ব্যবহারে তার গাছের পেয়ারাতে তুলনামূলকভাবে কম পোকা ধরেছে। তাদের ধানের ক্ষেত্রেও ভালো হয়েছে।

কিছু নারী যারা গবাদি পশুপালনের যে প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন তা অন্যদের সাথে শেয়ার করেছেন। তারা আরো বেশি শিখতে চান এবং পুরুষদের মতোই এক্সপোজার ভিজিট (বীঢ়ড়ংঁৎব াংরংরঃ) এ যেতে চান। নারীরা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গবাদিপশু লালনপালন, শাক সবজি চাষ, গাছ লাগানো, হাঁস মুরগি পালন প্রভৃতি শেখার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তারা ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা সম্পর্কেও জানতে চেয়েছেন।

ঙ) ভূমি ও সম্পদে নারীর প্রবেশাধিকার

৫নং সারণিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উত্তর প্রদানকারী নারীদের পরিবারের বড় একটা অংশ (২০ জন) ৭ থেকে ১০ শতক পর্যন্ত এবং আরেকটা অংশ ১ থেকে ৬ শতক পরিমাণ জমির মালিক যা তাদের বাড়ির নিকটবর্তী। কেউ ২৫ শতকের বেশি জমির মালিক নয়। নারীদের জমির মালিকানার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যেসব নারীরা তাদের নিজেদের নামে জমি আছে বলে দাবী করেন তারা তাদের স্বামীদের মৃত্যুর পরে জমির মালিক হয়েছেন অথবা কিছু ক্ষেত্রে তারা তাদের বাবার কাছ থেকে উপহার পেয়েছেন। হিন্দু নারীদের কোন জমি ছিল না। নারীরা মনে করেন জমি তাদের শক্তি দেয় এবং এজন্যই এর মালিকানা পুরুষদের প্রতিযোগি করার প্রবণতাও তৈরি করে। জমি ছাড়াও, এনজিও কর্মসূচির ঋণ ও জমার (credit) ক্ষেত্রেও তাদের প্রবেশাধিকার আছে বা ছিল। তারা যে ঋণটা নিয়েছে তার পরিমাণ এক না কিন্তু উভয় জেলাতেই সর্বোচ্চ পরিমাণের চেয়ে অনেক কম। যে খাতগুলোতে ঋণের টাকা ব্যয় করা হয়েছে সেগুলোও ভিন্ন রকমের। যাইহোক, উভয় জেলাতেই ঋণের টাকা কৃষি ও নির্মাণ কাজে ব্যয় হয়েছে। অন্য কারণগুলোর মধ্যে বলেছেন, জমি ইজারা নেওয়া, জমি বন্ধকী, পয়নিষ্কাশনের কাজ, আগের ঋণ শোধ, পরিবারের কল্যাণ ও ব্যবসাতে ঋণের টাকা ব্যয় হয়েছে। বেরাকুঠি গ্রামের একজন সন্তানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ঋণ বিনিয়োগ করার কথা বলেছেন।

চ) সামাজিক মাত্রা: স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রযুক্তি

বস্তুগত পরিবেশ এর সাথে সাথে, সমাজে আরো কিছু পরিবর্তন হয়েছে যা নারী কৃষকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি এবং জীবনযাপনে প্রভাব ফেলেছে। নারীরা অতীতে কষ্টের কথা বলেন, যখন তাদের অলংকার বিক্রি করতে হতো যাতে তাদের স্বামীরা যথাযথ চিকিৎসা পায়। গর্ভবতী মায়েরা বাড়িতে সন্তান জন্ম

বেরাকুঠীতে সভা

দিতেন। এখন তারা হাসপাতাল বা স্থানীয় ক্লিনিকে যান। একজন নারী বলেন, "আগে, আমরা ক্ষতস্থান হলুদ দিয়ে চিকিৎসা করতাম, এখন টিকা, এ্যাম্বুলেন্স আছে।"

নারীদের পোশাক পরিচ্ছদেও সামাজিক পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়েছে। "আগে আমরা কখনোই জুতা পরতাম না, এখন পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। আমাদের জীবনে খুব কম গয়না ছিল কিন্তু এখন আমরা জাকজমকপূর্ণ বিয়ের অনুষ্ঠান দেখি। আমাদের মায়েরা কখনোই পেটিকোট বা ব্লাউজ পরত না, শুধু শাড়ি পরত কিন্তু এখন মেয়েদের সুন্দর শাড়ি পরতে দেখা যায়।"

অনেক বয়স্ক নারী বলেন, কীভাবে তাদেরকে বাল্যবিবাহ মেনে নিতে হয়েছিল। একজন বলেন, তার বিয়ের পরে তার প্রথম দুধ দাঁত পড়েছিল। সাধারণত দুধ দাঁত হচ্ছে জন্মের পর পরই যে দাঁত ওঠে তাকে বলা হয়। এই দাঁত সাধারণত: ৫-৭ বছর বয়সের সময় সব পড়ে যায় এবং নতুন দাঁত ওঠে। বিয়ের পর দুধ দাঁত পড়া অর্থ বিয়ের সময় কনের বয়স ছিল সম্ভবত: ৫-৭ বছর। আরেকজন দাবি করেন, সে এত ছোট ছিল যে, সে এমনকি কবুলও বলতে পারেনি (বিয়েতে তার সম্মতি ঘোষণা), তার পাশে একজন তার হয়ে বলে দিয়েছিল। যৌতুকের পরিমাণ নির্ভর করতো কনেদের অবস্থার উপর যা ৫০০ টাকা থেকে ৪০,০০০ পর্যন্ত হতো।

প্রযুক্তিও তাদের জীবনে পরিবর্তন এনেছে। "আগে নারীরা পারিবারিক জীবনে নিয়োজিত ছিল এবং এখন তারা মোবাইল ফোনে গল্পগুজব করে।"

''বাসনা (শুকনো কলাপাতা) পুড়িয়ে যে ছাই হতো তা দিয়ে নারীরা কাপড় ধুতো, এখন তারা সাবান ব্যবহার করে।'' সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপকভাবে পাল্টে গেছে। নারীরা বলে, ''আগে বাচ্চারা তাদের বাবাকে ভয় পেত, এখন বাবার কাছে সিগারেটও চায়।''

তবে জেন্ডার বিষয়ে মনোভাবে সেরকম পরিবর্তন হয়নি। এমনকি নারী উত্তর প্রদানকারীকে বলতে শুনেছি যে, নারীরা তাদের নিজেদের দোষের জন্য ধর্ষণের শিকার হয়।

ছ) সিদ্ধান্তগ্রহণ ও সচেতনতা

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সমাজে তার সামর্থ্যকে একটা অগ্রগণ্য অবদান হিসেবে দেখা হয়। অনেক এলাকা রয়েছে যেখানে প্রথাগত বিশ্বাস নারীর অবদানকে তাচ্ছিল্য করে এবং অনেক ক্ষেত্রে করে না। উদাহরণস্বরূপ, উত্তরদাতা অনেকেই ভেবেছে বা ভাবে যে তাদের বাজারে যাওয়া উচিত নয় বরং তাদের স্বামীদের যাওয়া উচিত। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হচ্ছে যদিও তা খুব ধীরভাবে। দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের এই রূপান্তর নারী কৃষকদের অনেকের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া এনেছে। যা শুধু বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের পরিবেশের কথাই বলে। ''আমাদের কাজ থেকে আমরা যাই উপার্জন করি পুরুষরা তা নিয়ে নেয়।'' তারা আরো বলেন যে, এনজিও আমাদের সঞ্চয়ের কিছু নিয়ে যায় কিন্তু তাদের নিজেদের জন্যও কিছু সুবিধা হয়। টাকা নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিশ্র সম্পর্ক রয়েছে। একজন বিধবা বলেন, তার স্বামী নাই যে তাকে দিতে পারে। তার ছেলে ও টাকা দেয় না বরং সে হাঁস মুরগী পালন করে যে টাকা উপার্জন করে তা থেকে সব টাকা নিয়ে যায়। ''ইপিজেড এ কাজ করে তার বউ টাকা নিয়ে আসে এবং সে তার বউ থেকেও নেয়। সে সহজ সরল এবং আমার ছেলে চালাক।

অন্য উত্তর দাতারা পর্যবেক্ষণ করে বলেন, ''স্ত্রীরা আগে স্বামীদের কথা শুনত, এখন এতটা না। মাঝে মাঝে আমি আমার স্বামীর পছন্দ অনুযায়ী কাজ করি মাঝে মাঝে নিজের ইচ্ছায়।''

একজন নারী বলেন, ''আগে নারীরা ভীত ছিল, এখন সেরকমটা না। নারীরা প্রতিবাদ করে, তাদের অধিকার দাবি করে। স্ত্রীর ধান, শস্য বিক্রির অধিকার আছে। স্বামী তাতে আপত্তি করে না।''

''আগে পুরুষরা দিনমজুরি দিত কিন্তু পরিবারের চাহিদা মেটাতে পারত না। আমাদেরও অবদান রাখতে হতো। আমরা বিনোদন/শখের জন্য কিছু ব্যয় করতে পারতাম না। এখন আমরা সারাদিন ধরে খুব বেশি কাজ করতে চাই না। কিছুটা সময় নিজেদের কাছে রাখতে চাই। যখন আমাদের সময় থাকে কম্পিউটার থেকে ডাউনলোড করি এবং আমাদের ফোনে ছবি দেখি। আমরা বাংলা, হিন্দি নাটক, ধারাবাহিক, যাত্রা দেখতে পছন্দ করি।''

জ) আঞ্চলিক বৈচিত্র্য

সাতক্ষীরা এবং নীলফামারী দু জেলাতে আঞ্চলিক বিভিন্নতা স্পষ্ট ছিল। গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরা হলো:

বীজ সংরক্ষণ করেন কি না সে ব্যাপারে নারীরা ভিন্ন ভিন্ন উত্তর প্রদান করেছেন। নিচের টেবিল অনুসারে, সাতক্ষীরার অংশগ্রহণকারীরা নীলফামারীর জয়চণ্ডীদের চেয়ে বেশি পরিমাণে বীজ সংরক্ষণের প্রবণতা দেখান। এটা হতে পারে এ কারণে যে, জয়চণ্ডী শিল্প এলাকার চেয়ে মাত্র দুই কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং সেজন্যই বাড়িতে বীজ সংরক্ষণের চেয়ে স্থানীয় বাজার থেকে কিনে আনা অধিকতর সহজ। এটা আরো ব্যাখ্যা করতে পারে যে, তরুণ প্রজন্মদের মধ্যে প্রথাগত কৃষিচাষের প্রতি আগ্রহের অভাব।

সারণি-১১ : সাক্ষাৎকার দাতার বীজ সংরক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

বীজ সংরক্ষণ করেন কিনা?	নীলফামারী সাতক্ষীরা			
	বেড়াকুঠি	জয়চন্ডি	বংশিপুর	ধুমঘাট
হ্যা	১১	৫	১৩	১৫
না	৪	১০	২	
মোট	১৫	১৫	১৫	১৫

এটা প্রতীয়মান হয়েছে যে, সাতক্ষীরায় মহিলাদের শিক্ষার ব্যাপ্তি ঘটেছে চার্চের প্রভাবে। কিন্তু সাধারণ অভিযোগ ছিল যে, নারীরা চাকুরি পাচ্ছে না। সুতরাং তারা হতাশাবোধ করছেন। ধুমঘাট গ্রামের মুণ্ডা উত্তরদাতারা বলেন যে, তাদের তিনজন মেয়ে নার্স হিসেবে কাজ করছেন। তাছাড়া, সাতক্ষীরায় বেশ কয়েকটি সামাজিক কর্মসূচি চালু হয়েছে। সেগুলো হলো: একটি বাড়ি, একটি খামার (সুবিধা বঞ্চিতদের জন্য সরকারের কর্মসূচি) এবং বেসরকারি কর্মসূচিগুলো গৃহিত হয়েছে স্থানীয় এনজিওদের দ্বারা। যেমন, সুন্দরবন আদিবাসী সংস্থা, ইতালিয়ান ক্যাথলিক চার্চের ফাদার লুইজি এবং কারিতাস ও গ্রামীণ ব্যাংকের জাতীয় কর্মসূচি।

সারসংক্ষেপ বিশ্লেষণ

Esha Sraboni, Agnes, R, Quisumbeng and Akhter, V. Ahmed, তাদের How empowered are Bangladeshi Women in the Agricultural Setting? Empirical Evidence Using a New Index' প্রবন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন যে, ক্ষমতায়ন অর্থে সবচেয়ে বড় ফাঁকসমূহ "সমাজের নেতৃত্ব

এবং সম্পদে নিয়ন্ত্রণ ও প্রবেশাধিকার" এর মধ্যে। তাদের একটি মন্তব্যের মধ্যে রয়েছে আঞ্চলিক বৈচিত্র্য এবং যে কোনো ক্ষমতায়ন সূচকের পরিস্থিতি যা কৃষি প্রতিবেশে নারীর অবস্থান বুঝাতে নির্মিত হচ্ছে। বাংলাদেশে নারী কৃষকের উপর বর্তমান গবেষণার ফলাফল, উক্ত মন্তব্যকে সমর্থন করে। একটা সমাজে প্রযুক্তিগত, পরিবেশগত ও অবকাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্যে যা ধরা হয় তা একটা বিশ্বাস ব্যবস্থা যেটি পুরোপুরিভাবে শত বছরের প্রথায় প্রোথিত। বাংলাদেশের নারী কৃষকরা একটা স্বতন্ত্র্য অবস্থান ধারণ করে, তারা প্রথাগত জ্ঞান এবং কৃষিচর্চা উভয়েরই ভাণ্ডার এবং পরিবর্তনের ধারায় নিজেদের দেখে পরিবর্তনকে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়।

অতি সম্প্রতি, জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষির পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি এবং উন্নয়নমূলক পূর্বধারণাসমূহ পুনর্বার দেখতে বাধ্য করেছে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি, আমাদের জীবন, জীবনব্যবস্থা এবং প্রধানত অস্তিত্ব তদারকি এবং টেকসই করার জন্য। কৃষি চিন্তার পুনর্ভাবনা এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রধান বিষয়। তাই এই পূণর্ভাবনা প্রক্রিয়ায় নারী কৃষকদের ভূমিকা একটি অতীব জরুরি বিষয়। যদিও বাংলাদেশের "জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩" এ বিষয়গুলোকে উল্লেখ করেছে। যেমন, মজুরিতে লিঙ্গ সমতা অর্জনের পরিস্থিতির দিক থেকে, কিন্তু সমস্যা সমাধান বা চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে এসব পর্যাপ্ত নয়, যা এ গবেষণায় নারীরা নিজেরাই তা প্রকাশ করেছেন। তাই বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি পুনর্গঠনে সামগ্রিকভাবে তাদের সম্ভাবনাপূর্ণ বোধগম্যতার কাজটি আমাদের উপর বর্তায়। এ প্রচেষ্টায় বর্তমান গবেষণাটি কিঞ্চিৎ দাগ কেটেছে। এ পথকে নির্দেশ করতে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার তার কিছু পয়েন্ট পরের অংশে দেওয়া হলো।

ভবিষ্যৎ অভিমুখে

নারী কৃষকদের জ্ঞানে প্রবেশাধিকার দরকার। তাই কৃষি সম্প্রসারণ সেবাসমূহ আরো জোরদার করতে হবে, তাদের সেবার বিষয়বস্তু ও ধরন আরো জেন্ডার বান্ধব করতে। এই গবেষণায় বর্ণিত প্রযুক্তিতে যেসব সম্ভাব্যতা আছে তা পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে হবে।

প্রথাগত কৃষিতে ভালো চর্চা হিসেবে নারী কৃষকদের যে সংগ্রহ রয়েছে, যেমন বীজ সংরক্ষণে অবদানকে সমর্থন করার পাশাপাশি লিপিবদ্ধ এবং প্রচার করতে হবে যাতে জ্ঞানটা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। নারী কৃষক শুধুমাত্র নতুন কৃষিচর্চা ও জ্ঞানে দক্ষ হবে না, সেইসাথে উদ্ভাবনী বিষয়ের অবতারণায় সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদের সাহায্য করবে।

পরিবেশবান্ধব কৃষিমূলক চর্চায় উজ্জীবিত এই আন্দোলনে তরুণদের জড়িত করতে জাতীয় শিক্ষাক্রমে এই বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাদেরকে আরো বেশি উৎসাহিত করতে দুর্যোগপ্রবণ এলাকা এবং যেসব এলাকায় সফলতার গল্প রয়েছে সেখানে এক্সপোজার ভিজিটের ব্যবস্থা করতে হবে।

সাতক্ষীরার ধুমহাটে দলীয় সভা

সামগ্রিক ধারণায় লিঙ্গসমতা, গ্রামের সব নারীদের মাঝে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সম্পত্তি ও সম্পদের নিয়ন্ত্রণ অর্জনে নারীদের সক্ষম করা এ প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ। স্বল্প মেয়াদে বিশেষ ঋণ প্রদান করা যেতে পারে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে কাঠামোগত পুনর্গঠনের মাধ্যমে জমি ও সম্পত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করবে।

নীতিগত পদক্ষেপে আঞ্চলিক এবং স্থানীয় বৈচিত্র্য যেমন আদিবাসী সাংস্কৃতিক চর্চা, ভৌগলিক এবং বায়ুমন্ডলীয় পরিস্থিতি এবং সামাজিক সংহতি সম্পর্কে আলোচনা করার প্রচেষ্টা থাকতে হবে।

তথ্যসূত্র

Government of Bangladesh, National Agricultural Policy, 2018

Kabeer, N. 1994. “Women’s Labour in the Bangladesh Garment Industry: Choices and Constraints.” In C. Fawzi El-Solh & J. Mabro (eds.), *Muslim Women’s Choices.Religious Belief and Social Reality* (pp. 164-183). Oxford, UK: Berg Publishers.

Rahman, S. 2000. “Women's Employment in Bangladesh Agriculture: Composition, Determinants, and Scope.” *Journal of Rural Studies, 16*(4): 497-507.

——2010. “Women’s Labour Contribution to Productivity and Efficiency in Agriculture: Empirical Evidence from Bangladesh.” *Journal of Agricultural Economics,61*(2): 318-342.

Quisumbing, A. R., and J. A. Maluccio.2003. “Resources at marriage and intra household all ocation: Evidence from Bangladesh, Ethiopia, Indonesia, and South Africa.”*Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 65*(3): 283-327.

Quisumbing, A. R., and N. Kumar. 2011. “Does Social Capital Build Women's Assets?

The Long-term Impacts of Group-based and Individual Dissemination of Agricultural Technology in Bangladesh.” *Journal of Development Effectiveness*,3 (2): 220–242.

Quisumbing, A., S. Roy, J. Njuki, K. Tanvin and E. Waithanji. 2013. “Can dairy ValueChain Projects Change Gender Norms in Rural Bangladesh? Impacts on Assets, Gender Norms, and Time Use.” Discussion Paper No. 1311. Washington, DC:International Food Policy Research Institute.

Skoufias, E. 2005. “PROGRESA and its Impacts on the Welfare of Rural Households in Mexico.” Food Consumption and Nutrition Division Discussion Paper No. 139.Washington, DC: International Food Policy Research Institute

Sraboni, E., A. R. Quisumbing and A. U. Ahmed. 2014, “How Empowered are Bangladeshi Women in the Agricultural Setting? Empirical Evidence Using a New Index” *Bangladesh Development Studies, Vol. XXXVII, September 2014*, No. 3

Sraboni, E., A. R. Quisumbing and A. U. Ahmed. 2012. “The Women’s Empowerment inAgriculture Index for Bangladesh’s Feed the Future Zone of Influence.” Projectreport submitted to the U.S. Agency for International Development.International Food Policy Research Institute, Dhaka.

Udry, C., J. Hoddinott, H. Alderman and L. Haddad. 1995. “Gender Differentials inFarm Productivity: Implications for Household Efficiency and AgriculturalPolicy.” *Food Policy, 20*(5): 407-423.

RESEARCH INITIATIVES BANGLADESH

Research Initiatives, Bangladesh (RIB)

Research Initiatives, Bangladesh (RIB) was founded to promote knowledge on poverty alleviation that is relevant, useful, innovative, participatory and action oriented, with a special focus on marginalized and socially excluded communities. RIB views poverty as a multidimensional process and recognizes that the needs of poverty groups go beyond simple income generation, food and shelter, to areas such as equality, dignity, justice, human rights and good governance. RIB supports marginalized and minority groups who are unable to access basic services due to social discrimination and conduct people's research (*Gonogobeshona*) on the development schemes that affects them most, in order to develop ownership and generate community mobilization. For more information please visit: www.rib-bangladesh.org

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG SOUTH ASIA

Rosa Luxemburg Stiftung (RLS)

Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) is a political foundation from Germany that works within the tradition of workers' and women's struggles. Bearing the name of Democratic Socialist Rosa Luxemburg (1871-1919), the foundation serves as a forum for debate and critical thinking about political alternatives, as well as a research centre for progressive social development. RLS promotes the discourse among activists, scientists and intellectuals from South Asia and Germany as well as from other regions of the world. A special focus lies on creating networks among countries of the Global South. The foundation also provides space for critical discourse and publishes educational material. For more information please visit : www.rosalux.in